দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
তারিখঃ১৮/০৬/২০২৬খ্রি. (পৃঃ১৮)

কৃষির চ্যালেঞ্জ ও উন্নয়নের পথরেখা

ড. এম আব্দুল মোমিন

দেশের কৃষির প্রথম ও প্রধান চ্যালেঞ্জ কৃষি শ্রমিকের অপ্রতুলতা এবং শ্রমিকের মূল্যবৃদ্ধি। কৃষকের ছেলে আর কৃষক হতে চায় না, শ্রমিকের ছেলে শ্রমিক হতে চায় না। এটাই বাস্তবতা। বিগত এক দশকে কৃষি শ্রমিকের দৈনিক মজুরি প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। শিল্প খাতের বিকাশ ও নগরমুখী স্থানান্তরের ফলে গ্রামে কৃষি শ্রমিকের সংকট দেখা দিয়েছে।

কৃষি এখনো দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান প্রায় ১৩ শতাংশ। অথচ এই খাতটি আজ এক গভীর সংকটের মুখে। একদিকে উৎপাদন খরচ আকাশছোঁয়া, অন্যদিকে ফসলের ন্যায্যমূল্য নেই। শ্রমিকের মজুরি বেড়েছে, সার ও কীটনাশকের দাম চড়েছে, সেচের খরচ বাড়ছে এই তিনটি চাপ মিলিয়ে কৃষক দিশাহারা। এ পরিস্থিতিতে কৃষিকে টেকসই করতে হলে, দরকার আধুনিকায়নের পথে হাঁটা, প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

দেশের কৃষির প্রথম ও প্রধান চ্যালেঞ্জ কৃষি শ্রমিকের অপ্রতুলতা এবং শ্রমিকের মূল্যবৃদ্ধি। কৃষকের ছেলে আর কৃষক হতে চায় না, শ্রমিকের ছেলে শ্রমিক হতে চায় না। এটাই বাস্তবতা। বিগত এক দশকে কৃষি শ্রমিকের দৈনিক মজুরি প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। শিল্প খাতের বিকাশ ও নগরমুখী স্থানান্তরের ফলে গ্রামে কৃষি শ্রমিকের সংকট দেখা দিয়েছে। ধান রোপণ ও কাটার মৌসুমে একজন শ্রমিকের মজুরি ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। বড় জমির মালিকের জন্য এটি বহনযোগ্য হলেও ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের জন্য এ এক অসহনীয় বোঝা। কিন্তু সমাধানের পথ যে নেই তা কিন্তু নয়। শ্রমিকের অপ্রতুলতা মেটাতে সমাধানের পথ কৃষি যন্ত্রায়ন ও ফার্ম-মেকানাইজেশন। যেমন- ধান রোপণে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ব্যবহার করলে প্রতি বিঘায় শ্রমিক খরচ ৬০-৭০ শতাংশ কমানো সম্ভব। একটি ট্রান্সপ্লান্টার যেখানে একদিনে ২০-২৫ জন শ্রমিকের কাজ করতে পারে, সেখানে প্রতি বিঘায় খরচ মাত্র ৮০০-১০০০ টাকা। সরকারের কৃষি যন্ত্রপাতি ভর্তুকি কার্যক্রমের আওতায় কম্বাইন হার্ভেস্টার কেনায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকি পাওয়া যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ধান কর্তনে কম্বাইন হার্ভেস্টার ব্যবহার করা গেলে কর্তন খরচ প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব।

কিন্তু প্রান্তিক কৃষকের পক্ষে তো যন্ত্রপাতি কেনা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে কাস্টম হায়ারিং সেন্টার বা সমবায়ভিত্তিক যন্ত্রপাতি ভাড়া সেবা একটি কার্যকর সমাধান হতে পারে। কৃষক দল গঠন করে সম্মিলিতভাবে যন্ত্রপাতি কিনলে বিনিয়োগ ভাগ হয়ে যায় এবং প্রতিটি পরিবার লাভবান হবে। কৃষিযন্ত্রভিত্তিক ছোট ছোট উদ্যোক্তা সৃষ্টি বর্তমানে গ্রামীণ অর্থনীতির উৎকর্ষের একটি ইতিবাচক দিক। অনুরূপভাবে ফসলের আন্তঃপরিচর্যায় ড্রোন প্রযুক্তি ভাড়ায় ব্যবহার করার উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা যেতে পারে। কীটনাশক ও সার ছিটানোর কাজে ড্রোন ব্যবহার বাংলাদেশে শুরু হয়েছে। একটি ড্রোন প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৭-১০ একর জমিতে স্প্রে করতে পারে, যেখানে ১০ জন শ্রমিকের দরকার হতো। শুধু শ্রমিক খরচ সাশ্রয় নয়, ড্রোনে ওষুধের অপচয়ও কমে আসে।

কৃষিতে দ্বিতীয় প্রধান চ্যালেঞ্জ সার ও কীটনাশকের মূল্যবৃদ্ধি। আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি এবং টাকার অবমূল্যায়নের কারণে আমদানি নির্ভর এই উপকরণগুলোর দাম ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। একইভাবে কীটনাশকের দামও বেড়েছে। কিন্তু অনেক কৃষক অতিরিক্ত মাত্রায় সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে উৎপাদন খরচ নিজেই বাড়িয়ে ফেলছেন।

এ থেকে পরিত্রাণের পথ সুষম ও বিকল্প কৃষি পদ্ধতি। যেমন- মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার প্রয়োগ মাটির গুণাগুণ না জেনে অনুমান করে সার দেয়া অর্থের অপচয়। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (SRDI)-এর মাটি পরীক্ষা সেবা ব্যবহার করে প্রয়োজন অনুযায়ী সুষম সার প্রয়োগ করলে সার ব্যয় ২০-৩০ শতাংশ কমানো সম্ভব। জৈব সার, গোবর সার, কম্পোস্ট, ভার্মি কম্পোস্ট এবং সবুজ সার (ধৈঞ্চা) রাসায়নিক সারের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে।

জৈব সার একদিকে উৎপাদন খরচ কমায়, অন্যদিকে জমির দীর্ঘমেয়াদি উর্বরতা রক্ষা করে। জৈব পণ্যের বাজারে এখন ভালো দামও পাওয়া যায়। বায়োফার্টিলাইজার ও বায়োপেস্টিসাইড ট্রাইকোডার্মা, রাইজোবিয়াম, নিম-ভিত্তিক কীটনাশক এগুলো পরিবেশবান্ধব এবং সাশ্রয়ী বিকল্প। দেশে কিছু প্রতিষ্ঠান এখন এগুলো উৎপাদন ও বিক্রি করছে। দীর্ঘমেয়াদে এ পথে হাঁটলে রাসায়নিক নির্ভরতা কমে আসবে।

কীটনাশকের অন্ধ ব্যবহার না করে পোকামাকড়ের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনমাফিক কীটনাশক বা বালাইনাশক প্রয়োগ করার পদ্ধতি হচ্ছে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বা আইপিএম (IPM)। এতে কীটনাশক ব্যয় ৩০-৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব। প্রাকৃতিক শত্রু (উপকারী পোকা) সংরক্ষণ, সোলার-লাইট ট্র্যাপ, ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করেও পোকা দমন করা যায়।

কৃষির তৃতীয় প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ব্যয়বহুল সেচ ব্যবস্থা। বিশেষ করে, বাংলাদেশে বোরো মৌসুমে সেচ ছাড়া চাষ অসম্ভব। ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনে বিদ্যুৎ বা ডিজেলচালিত পাম্পের ব্যবহার একটি বড় ব্যয়ের খাত। বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং ঘন ঘন লোডশেডিং এর কারণে সেচ খরচ প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। এ ছাড়া ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে পানির স্তর নামছে, যা ভবিষ্যতের জন্য এক বড় বিপদ।

এই ক্ষেত্রে সমাধানের পথ দক্ষ ও নবায়নযোগ্য সেচ প্রযুক্তি। সোলার পাম্প বা সৌরশক্তিচালিত পাম্প এখন বাংলাদেশে ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। প্রাথমিক বিনিয়োগ বেশি হলেও দীর্ঘমেয়াদে জ্বালানি খরচ প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনা সম্ভব। একটি সোলার পাম্প ৩-৫ বছরের মধ্যে তার খরচ উঠিয়ে আনতে পারে। সরকারি ভর্তুকিতে এই পাম্প স্থাপনের সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া প্রচলিত প্লাবন সেচে পানির অপচয় ৫০-৬০ শতাংশ পর্যন্ত হয়। ড্রিপ ও স্প্রিংকলার সেচ সেচে পানি সরাসরি গাছের গোড়ায় পৌঁছায়, ফলে অপচয় মাত্র ১০-১৫ শতাংশে নামে। সবজি ও ফলের বাগানে ড্রিপ সেচ ব্যবহার করলে একই পানি দিয়ে দ্বিগুণ জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব।

ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার কমাতে হলে পানি সংরক্ষণ ও বৃষ্টির পানির ব্যবহার খাল ও পুকুর পুনঃখনন করে বর্ষার পানি ধরে রেখে শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহার করা সম্ভব। অনেক এলাকায় রেইনওয়াটার হার্ভেস্টিং পদ্ধতিতে ছাদ বা বিশেষ জলাধারে পানি সংরক্ষণ করে সবজি চাষে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ জন্য খাল খনন, রিটেনশন পন্ড ও ভূউপরিস্থ সেচ পদ্ধতির সম্প্রসারণ দরকার। ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা কমাতে নদী, খাল, জলাশয়ের ভূউপরিস্থ পানির সদ্ব্যবহার করা উচিত। এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের খাল খনন কর্মসূচি একটি ইতিবাচক দিক বটে।

কৃষিকে লাভজনক করার অন্যান্য কৌশলের মধ্যে ফসল বৈচিত্র্যায়ন ও উচ্চমূল্যের ফসল চাষ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শুধু ধান চাষ করে বাংলাদেশের কৃষক লাভবান হতে পারবেন না। সবজি, ফুল, ফল, মসলা, ঔষধি উদ্ভিদ এসব উচ্চমূল্যের ফসলে লাভের পরিমাণ ধানের চেয়ে ৩-৫ গুণ বেশি হতে পারে। ক্যাপসিকাম, ব্রোকলি, স্ট্রবেরি, ড্রাগন ফল এসব অপ্রচলিত ফসলে অগ্রগামী কৃষকেরা ইতোমধ্যেই সাফল্য পেয়েছেন।

উন্নত বিশ্বে লাভজনক কৃষির অন্যতম উদাহরণ-চুক্তিভিত্তিক কৃষি (Contract Farming) প্রক্রিয়াজাতকারী কোম্পানি বা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিতে ফসল উৎপাদন করলে বাজারে দামের ওঠানামার ঝুঁকি কমে। কৃষক আগেই জানতে পারেন তাঁর ফসলের মূল্য কত হবে, ফলে পরিকল্পনা করা সহজ হয়। দেশে প্রাণ, এসিআইসহ বিভিন্ন কোম্পানি বর্তমানে চুক্তিভিত্তিক কৃষি চালু করেছে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে দেশে উৎপাদন মৌসুমে যথাযথ কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজন উদ্যোগ না থাকায় কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের প্রায় ৩০ ভাগ বিভিন্নভাবে নষ্ট হয়ে যায়। অথচ উৎপাদন মৌসুমে ফসল বিক্রি না করে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত বা প্যাকেজিং করে বিক্রি করলে কৃষক অনেক বেশি দাম পেতে পারেন। আলু থেকে চিপস, টমেটো থেকে কেচাপ, আম থেকে জুস বা আচার– ছোট আকারের গ্রামীণ প্রক্রিয়াজাতকরণ উদ্যোগ কৃষকের আয় বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে পারে।

কৃষিতে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য একটি বড় সমস্যা। এ থেকে মুক্তি পেতে ডিজিটাল বাজার ব্যবস্থা ও সরাসরি বিক্রয়ের জন্য স্থানে-স্থানে কৃষকের বাজার সৃষ্টি করা যেতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমভিত্তিক যে বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সেখানে ভোক্তার আস্থার সংকট প্রকট। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি পেতে কৃষককে সরাসরি ভোক্তার সাথে যুক্ত করতে হবে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম (যেমন- কৃষকবন্ধু অ্যাপ) ব্যবহার করে বা কৃষক বাজার স্থাপন করে কৃষক তাঁর ন্যায্যমূল্য পেতে পারেন।

আরেকটি সমাধানের পথ হচ্ছে, সমবায়ভিত্তিক কৃষি। একা কৃষক যা পারেন না, সমষ্টিগতভাবে তা সম্ভব। সমবায় গঠন করে কৃষকরা মিলে সার, বীজ, যন্ত্রপাতি কিনলে পাইকারি সুবিধায় কম দামে পাওয়া যায়। একইভাবে উৎপাদিত পণ্য একত্রে বিক্রি করলে দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ে। আমাদের দেশে কৃষি বীমা ব্যবস্থা না থাকলেও কৃষক কার্ডসহ কৃষি প্রণোদনার বিভিন্ন উদ্যোগ রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলে কৃষক যেন দেউলিয়া না হন, সে জন্য কৃষিবীমা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সরকারের প্রণোদনা ও ভর্তুকির সুযোগ সম্পর্কে সচেতন থাকলে উৎপাদন খরচ অনেকটাই কমানো সম্ভব।

আধুনিক কৃষির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো তথ্য ও প্রযুক্তি। স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে কৃষক এখন আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বাজারদর, কৃষি পরামর্শ সহজেই পেতে পারেন। কৃষি আবহাওয়া অ্যাপ ব্যবহার করে বৃষ্টি, বন্যা, খরার পূর্বাভাস পেয়ে আগাম পরিকল্পনা করা যায়। রিমোট সেন্সিং ও স্যাটেলাইট ইমেজ বিশ্লেষণ করে জমির স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্ভব। কৃষি মন্ত্রণালয়ের খামারি অ্যাপ এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

পরিশেষে বলা দরকার, বাংলাদেশের মতো দেশে কৃষির আধুনিকায়নে কৃষকের ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি ভূমিকা অপরিহার্য। যন্ত্রপাতিতে ভর্তুকি ও সহজ কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষি গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়িয়ে খরা-সহনশীল, লবণাক্ততা-সহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করতে হবে। কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে বাজার ব্যবস্থাপনা সংস্কার দরকার। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন বিশেষ করে সড়ক, বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট কৃষির আধুনিকায়নকে ত্বরান্বিত করবে। কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সেবা আরো কার্যকর করতে হবে।

বাংলাদেশে সংকট আছে, কিন্তু সম্ভাবনাও অপরিসীম। শ্রমিকের মূল্যবৃদ্ধি, সার-কীটনাশকের চড়া দাম ও ব্যয়বহুল সেচ এই তিনটি চাপ মোকাবিলা করতে হলে গতানুগতিক পথ ছেড়ে আধুনিকতার পথে হাঁটতে হবে। কৃষি যন্ত্রায়ন, জৈব কৃষি, সুষম সার ব্যবস্থাপনা, সোলার সেচ, ফসল বৈচিত্র্যায়ন ও ডিজিটাল বাজার– এই সমন্বিত পদ্ধতিই পারে কৃষককে ক্ষতির চাষ থেকে লাভের চাষে রূপান্তর ঘটাতে। এটি কোনো স্বপ্ন নয়, এটি একটি বাস্তব পথ যার উপর দিয়ে অনেক অগ্রগামী কৃষক ইতোমধ্যেই হাঁটতে শুরু করেছেন। কৃষি যদি লাভজনক না হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মাঠ ছেড়ে যাবে। কৃষি যদি সম্মানজনক ও লাভজনক পেশায় পরিণত হয়, তাহলে এ দেশের মাটি ও মানুষ দু'জনেই সুরক্ষিত থাকবে।

লেখক: ঊর্ধ্বতন যোগাযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), গাজীপুর।